Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 244 – 250
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে লাভপুর গ্রাম : একটি পর্যালোচনা

নূরমহম্মদ সেখ
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ
Email ID : nurmdsk665343@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
লাভপুর, জমিদার, বাজীকর, ডাকিনী, ডাকাত।

Abstract
লাভপুর বীরভূমের একটি বিখ্যাত গ্রাম। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মভিটে। তাঁর লেখাতে এখানকার ছবি ভেসে উঠে। একদা গ্রাম্য পল্লীগ্রাম লাভপুর বর্তমানে যে একটি শহরে পরিণত হয়েছে তার বিবর্তন দেখা যায়। এই গ্রামে ছিল জমিদারসমূহের বাসস্থান। এছাড়াও এই গ্রামের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র দেখা যায়, যেমন- সমস্ত শ্রেণীর মানুষের একত্রে বসবাস, বাজীকরদের আগমন, সাপুড়েদের সাপ খেলা দেখানো, গৃহিণীদের গৃহস্থলির কাজকর্ম ও অবসর সময়ে কাঁথা সেলাই, গপ্প; গ্রামে ডাকিনীর উপস্থিতির কথা, ডাকাতদের উপদ্রব ইত্যাদি বিষয়ে জানা যায়। এছাড়া সেই সময় গ্রামে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, রেল লাইন স্থাপন, দাওয়াতখানা স্থাপন ইত্যাদির ইতিহাস পাওয়া যায়। এর সঙ্গে সতি পীঠের অন্যতম পীঠ মা ফুল্লরা দেবীর কথা সেই সময়ের কথা জানা যায়।

Discussion
লাভপুর গ্রামের নাম কীভাবে বা কোথা থেকে এসেছে তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়না। লাভপুর প্রধানত একটি জমিদার প্রধান গ্রাম ছিল। তবে অনেক ব্যবসায়ী গোষ্ঠীও এখানে বসবাস করতো। লাভপুরের পাশেই একটি গ্রামের নাম ক্ষতিপুর। ফলে, স্বাভাবিক ভাবেই মনে করা যেতে পারে ব্যবসা-বাণিজ্যে যেহেতু লাভ-ক্ষতি কথা দুটি যুক্ত, হয়তো সেখান থেকেই এরূপ নামকরণ। এখানে পরস্পর বিরোধী দুটি জমিদার গোষ্ঠী বাস করতো। নবাবী আমল থেকে সরকার বংশীয়েরা ছিলেন এখানকার জমিদার। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বংশ উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে বহুধা ভাগে বিভিক্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে পড়ে একটি বিখ্যাত বাংলা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃবংশ এবং অন্যটি

ছিল আরও একটি বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ যারা ছিলেন গ্রামের প্রধান।[১] লাভপুর গ্রামটির বিবরণ অনেকটাই পাওয়া যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে। সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন চিত্র তাঁর অনেক গল্প ও সাহিত্যের বিষয়। এছাড়াও তাঁর লেখাতে প্রস্ফুটিত হয় গ্রাম জীবনের ভাঙনের কথা এবং নগর জীবনের বিকাশের কথা।[২] এরূপ একটি গ্রাম হল লাভপুর। লাভপুর একটি গণ্ডগ্রাম। ১৯০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই গ্রামের বাসিন্দা ছিল মোট ৭৫০ জন।[৩] যদিও পরবর্তী সময়ে এখানে একটি ইংরেজি হাই স্কুল (বর্তমানে 'যাদব লাল উচ্চ বিদ্যালয়') প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন এখানকার এক বিখ্যাত ব্যক্তি যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও ছিল একটি ছোট ইংরেজি স্কুল, একটি বালিকা বিদ্যালয়, একটি সংস্কৃত টোল, দাতব্য চিকিতসালয়, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, থানা এবং ডাকঘর।[৪] এইসমস্তকিছুই একটি উন্নত গ্রামের পরিচয় বহন করে, যা পরবর্তী সময়ে রূপ নিয়েছিল। লাভপুর পল্লীগ্রাম হলেও শহর ছিল। এখানে হিন্দু ও মুসলমান জাতীর মানুষ অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে পাশপাশি বসবাস করতেন। এছাড়া হিন্দু সমাজের উচু স্তরের (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি) ও নিম্ন স্তরের (যথা- ডোম, ভল্লা, বাগদি, হাড়ি মুচি প্রভৃতি) মধ্যেও কোন ভেদাভেদ ছিলনা। এক কথায় সাম্প্রদায়িকতার কোন চিহ্ন সেখানে বিরাজ করেনি। এই গ্রামে আসা ভিক্ষুকরা নানা ধরনের গান গাইত এবং বলতো-

"পীর বড় ধনীরে ভাই ঠাকুর বড় ধনী-
পীর গাজী- মুশকিল আসান কর, পীর গাজী;
তোমার গোপাল দুধ খাবেন জন্ম যাবে সুখে
দুঃখ তোমার দূরে যাবে- অন্ন দিয়ে ভুখে।"[৫]

লাভপুর অঞ্চলে মোট গ্রামের সংখ্যা ছিল ১৮৩ টি, যা প্রায় ১০৪.৬৮ বর্গ মাইল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। ১৯৫১ সালের গণনা অনুযায়ী মোট বাড়ির সংখ্যা ছিল ১৫২৮২ টি এবং জনসঙ্খ্যা ছিল ১৬৬৭৭৮ জন।[৬] ১৮৭২ সালে লাভপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিল মাত্র ৭৩৩ জন এবং গৃহ সংখ্যা ছিল ১৫৭ টি।[৭] যদিও অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ছিল ৬৫৯৮৩ জন।[৮]

সেইসময় নানা স্থানের লোক আপন আপন ভাগ্য পরীক্ষার জন্য বা ভাগ্য ফেরার জন্য এই গ্রামে আসতো। কেউ ব্যবসা করে ধন সঞ্চয় করার চেষ্টা, কেউ ভৃত্যের কাজ করেও সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করতো। বাণিজ্যের অবনতি ঘটতে শুরু করলেও অনেকে নিজেদের অবস্থা উন্নত করার জন্য জমিদারবর্গের সেবায় নিজেদের নিয়োগ করতে থাকে। জমিদারবর্গদের কার্য পরিচালনার জন্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি গোষ্ঠীর মানুষের প্রয়োজন পড়েছিল।[৯]

সমাজের নেতৃত্বর আসন নিয়ে বিচিত্রসব বিরোধ সামাজিক জীবনের নানা স্তরে দেখা মিলেছিল। সমাজে কার কৃতিত্ব বেশি তা দেখানোর প্রচেষ্টা নিয়ে চলেছে দ্বন্ধ। দ্বন্ধ চলেছে সৌজন্য প্রকাশ নিয়ে, প্রতিদ্বন্ধিতা রাজভক্তি নিয়ে, প্রতিযোগিতা জ্ঞান মার্গের অধিকার নিয়ে। এছাড়াও জমিদার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছিল বিচিত্রসব বিরোধ ও প্রতিযোগিতা।[১০] সেই সঙ্গে আভিজাত্য, বংশ গৌরব এবং সম্পদের গৌরব নিয়ে প্রতিযোগিতায় লাভপুর গ্রামটি যেন হয়ে উঠেছিল একটি কুরুক্ষেত্র।[১১] সেকালের লাভপুর ব্যক্তিত্বে, আভিজাত্যে, যোগ্যতায়, রুচিতে এবং মহার্ঘ্যতায় বাংলার মহানগরীর রুচিসমৃদ্ধ পল্লীর সঙ্গে সমানে তাল মিলিয়ে চলেছিল।[১২] কেউ মানুষের সেবা করার জন্যে, কেউ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নিজের উদারতার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সেই সময় এখানে ছিল সম্পদের প্রাচুর্য। ক্ষেত ছিল উর্বর, ধান-গম-কলাই-সরষে প্রভৃতি ফসল মাঠে ফলত। প্রত্যেকের বাড়ীতে মড়াই করে ফসল বাধা থাকতো। গোয়াল ভর্তি গোরু, নেই দুধের অভাব। পুকুরে বড় বড় মাছ। বাজারদর ছিল মানুষের হাতের নাগালেই।[১৩] সমাজপতিরা মানুষের সুবিধার জন্যে গোরুর বাচ্চা হলে দুধ বিলি করতো, ক্রিয়াকর্মের সময় বাসনপত্র দান করতো, পথের ধারে আম-জাম-কাঁঠালের গাছ লাগিয়ে ছায়াদান করার চেষ্টা করতো, মানুষে-জীবে-পশুতে জল খাবে বলে পুকুর খনন করতো।[১৪] এছাড়া দারিদ্র পীড়িত মানুষের বাড়ীতে রান্না না হলে ততক্ষনেই ব্যবস্থা করতেন। দরিদ্র মানুষেরা নির্বাধে অন্যের পুকুরে মাছ ধরতে পারত, বাগান থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করতে পারত।[১৫] এছাড়া এখানকার স্ত্রীলোকেরা বিলাস বিভ্রমে দিন কাটাত না, সংসারের কাজকর্ম শেষ করে বৃথা গল্প বা পরনিন্দায় মুল্যবান সময় অতিবাহিত না করে সূতা কেটে বা কাপড়ে ফুল (এই ধরনের কাপড়ের নাম ছিল গুলবাহার) তুলে কিছু কিছু সঞ্চয় করতো।[১৬] উন্নত গ্রামের সাথে সাথে

পারস্পরিক সহযোগিতা ও মানবিকতার ছাপ গ্রামে দেখা দিয়েছিল। একাধারে গ্রাম ক্রমবর্ধমান ও অন্যদিকে মানুষের মধ্যে আত্মিক যোগাযোগ খুব কম জায়গাতেই দেখা যায়।

এখানকার গ্রাম পল্লীর প্রকৃত ছাপ বিরাজমান ছিল। এই গ্রামের মানুষেরা অবসর সময় কাটাত গল্প, আড্ডা দিয়ে। নানান বিষয় সেই আড্ডাতে আলোচিত হত। অনেক সময় সেখানে তর্ক, সমালোচনা ইত্যাদিও শুরু হয়ে যেত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় বহু লোক সকাল থেকে আসত এবং চলত যুক্তি, ব্যাখা, হাসি, ঠাট্টা যেন এক কোলাহলপূর্ণ আসর এবং চা পান।[১৭] জীবন বাবুর 'আরোগ্য নিকেতনে'ও চলত আড্ডার আসর। গ্রামের মানুষেরা সেইসময় সন্ধ্যার সময় বিভিন্ন জায়গায় ঠেক দিত এবং গল্প বলত। এরূপ কয়েকজন গল্পকারের নাম- ত্রিকাল ভট্টাচার্য, রামজী সাধু প্রমুখ।[১৮]

ছোট ছোট জমিদার প্রধান লাভপুর অঞ্চলে লক্ষপতি ব্যবসায়ীদের আগমনে তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়তে থাকল এবং জমিদার শ্রেণী যত বিব্রত বিপন্ন হতে থাকলেন ততই তাঁরা ভগবানের শরনাপন্ন হলেন। শুরু হল মানতের পর্ব।[১৯] দেবতার উদ্দেশ্যে চুল রাখা হত, এক হাতে শুধু দেবতার পুজা ছাড়া অন্যকিছু না করার মানত রাখা হত। এখানকার প্রধান দেবী ছিলেন মা ফুল্লরা। সতিপীঠের অন্যতম পীঠ। বলা হয়ে থেকে যে, বৌদ্ধ গয়ার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য মঠের কৃষ্ণানন্দগিরি নামক এক সন্ন্যাসী এসে এই পীঠের শ্রীবৃদ্ধি ঘটান। তার আগে একটি গাছের তলায় দেবী অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং শুধুমাত্র ফুল ও জল দিয়ে পূজা করা হত।[২০] দেবীর মন্দিরের সামনে নাট মন্দিরটি যাদব বাবুর সঙ্কল্প মত তাঁর পুত্রেরা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এখানকার ভোগ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন হরিলাল।[২১] ফুল্লরা দেবীর মন্দিরের পাশেই একটি ৩০০ বিঘা জুড়ে শুষ্ক জলহীন হ্রদ আছে, যার নাম দলদলি। মনে করা হয় যে, রামায়ণে যে দেবীদহ হ্রদের কথা আছে, যেখান থেকে রামচন্দ্র নীল পদ্ম সংগ্রহ করেছিল দেবী দুর্গার পূজা করার জন্যে, তা দলদলি থেকে অভিন্ন।[২২] বিভিন্ন প্রান্তর থেকে লোকের আসা-যাওয়া লেগেই থাকতো। প্রচুর সংখ্যক মানুষ পূজা করতে ও মানত দিতে আসত। মাঘী পূর্ণিমায় ৯ দিন ধরে এখানে মেলা হত, যেখানে প্রায় ৭০০ লোকের সমাবেশ হত।[২৩] লাভপুরে আরও একটি মেলা বসতো ফেব্রুয়ারি মাসে। এখানে প্রায় ২০০০ লোক আসত। এইসমস্ত মেলা ছাড়াও, পার্শ্ববর্তী গ্রাম ধনডাঙা (এপ্রিল মাসে ২-৪ দিন ধরে), মহেশপুর (কালীপূজার সময় ৫ দিন ধরে)-এ মেলা বসতো।[২৪]

এই গ্রামে জগদ্ধাত্রী পুজার মহা সমারোহ হত। এই উপলক্ষ্যে অতিথি সেবার জন্য ভোজনের ব্যবস্থা করা হত। যার দরুন, আশে পাশের গ্রামগুলি থেকে মানুষেরা ভির করতো। আনুমানিক দশ-পনের হাজার লোকের সমাগম হয়ে থাকতো। এই উৎসবে যাত্রাপালারও আয়োজন করা হত। সেই সময় খুব প্রচলিত খেমটা নাচেরও আয়োজন করা হয়ে থাকতো।[২৫] প্রাত্যহিক জীবনে গ্রামে নানান সময় নানান ধরনের মানুষের আগমন ঘটে থাকতো। সপ্তাহে দু-তিন দিন করে পটুয়ারা (জাতীতে মুসলমান) আসত এবং গান বাজনা করতো। বেদিয়া'রা (সাপুড়ে) আসত, বাদর নাচ আসত, ইরানিরা আসত এবং আসত সভ্য বেদের দল। তাঁরা গ্রামের মানুষের কাছে দক্ষিণা চাইত এবং নানান কথা আওড়াত। যেমন- 'সিত্যা রাম, সিত্যা রাম। বাড়ীর মঙ্গল হবে রাম। সাধু বিদায় কর রাম। - রাজ্য পাবে, পুত্র পাবে, মনের মত পত্নী পাবে'।[২৬] নিকটস্থ সিধলগ্রামে (ভবদেব ভট্টের জন্মভিটা) জাদুকর তথা বাজীকর জাতীর বাস ছিল।[২৭] তাঁরা অনেকসময় লাভপুর গ্রামে এসে ঢোল বাজিয়ে গান করে যাদুবিদ্যা দেখাত এবং ভিক্ষা করতো।

পার্শ্ববর্তী উদ্ধারনপুরের ঘাটে অনেকে দেহ রাখতে যেতেন। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরে মহাপ্রয়াণ হলেও একানকার মানুষেরা মৃত্যুর পূর্বে প্রশান্ত মুখে ঈশ্বরের নাম করে বিদায় সম্ভাষণ জানাতেন।[২৮] 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে এরূপ মৃত্যুকে সহজেই হাসি মুখে মেনে নিতে দেখা যায়। কিন্ত সময়ের সাথে সাথে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আপন করে নিতে দেখা যায়না। এছাড়া তখন গ্রামের মানুষের মুখের ভাষায় ছিল মিষ্টতা, মধুরতা ও সহনশীলতা। ঘরবাড়ী ছিল ঝকঝকে, নিকানো, আলপনা দেওয়া এবং প্রত্যেক বাড়ীতেই থাকতো কয়েকটি ফুলের গাছ-যা একরকম মনোরম পরিবেশ তৈরি করতো। এছাড়া, সকাল হলেই গ্রামের মানুষজন দেবালয়ে গিয়ে পূজার্চনা করতো, ব্রতপরায়না কুমারীর দলে মন্দির ভরে যেত।[২৯]

এখানকার মানুষেরা যেমন সহজ ও সরল ছিলেন তেমনি অনেকটা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ডাইনি' গল্পে স্বর্ণ ডাইনির কথা উল্লেখ করেছেন। গ্রামের ভদ্র পল্লী থেকে বেরিয়ে গ্রামের এক প্রান্তে জেলে পাড়ায় কুঁড়ে ঘর করে একাকী বাস করতে হয়েছিল। স্বর্ণ ছাড়াও অনেক ডাইনি ছিল গ্রামে।[৩০] সেকালে গ্রামের সাধারণ মানুষেরা সাত হাত কাপড় পরত, এবং মেয়েরা পড়ত তাঁতের খাটো সাড়ে আট হাত শাড়ী।[৩১] এছাড়া সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী পরত। প্যান্টের ব্যবহার অনেক পরে এসেছিল।

গ্রামে অনেক সুখ সমৃদ্ধি থাকলেও অন্যায় বা চুরি ডাকাতি যে হত না তা কিন্তু নয়। তারাশঙ্কর লাভপুরেরে পোড়া শেখের ডাকাতির গল্প উল্লেখ করেছেন। সে একাধারে দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।[৩২] লাভপুর অঞ্চলে এমনও দেখা গেছে যে, দু'-তিন মাসের মধ্যে তিন-চার ক্রোশের মধ্যেই চার-পাঁচটি ডাকাতির ঘটনা ঘটে যেত।[৩৩] উল্লেখযোগ্য, হায়দার আলি শেখের দলের (প্রায় ৪০টি ডাকাতির মত অপরাধে যুক্ত ছিল) আখড়া ছিল লাভপুর গ্রামের সন্নিকটে বামনিগ্রামে।[৩৪] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় 'মানুষুড়ে', 'ভল্লা' জাতীর কথা জানা যায় যারা পেশাই ছিলেন ডাকাত এবং লাভপুর সন্নিহিত গ্রামগুলোতেই ছিল তাঁদের বাসস্থান। ডোমপল্লী ছিল এই অঞ্চলের চোর ডাকাতের এক বিখ্যাত পল্লী।[৩৫]

তাছাড়া এই গ্রাম নাট্যচর্চার জন্যে সুপরিচিত ছিল। বিংশ শতকের সূচনা থেকেই লাভপুর গ্রামে নাট্যচর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং এখানে গড়ে উঠেছিল এক অনন্য দৃষ্টান্তমূলক কলাকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলী। জমিদার যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দুই সুযোগ্য পুত্র অতুলশিব ও নির্মলশিব কলকাতার মত উন্নতমানের আদর্শে গ্রামের মানুষদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন 'অন্নপূর্ণা থিয়েটার'। পরবর্তীকালে নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মঞ্চ গড়ে তোলেন, নাম 'অতুলশিব মঞ্চ'। নির্মলশিব ও নিত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৩-১৯৫৪) অনেক নাটক লিখেছিলেন; যথা- বীররাজা, নবাবী আমল, ভুলের খেলা, মুক্তি, আলেকজান্ডার ইত্যাদি।[৩৬] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক জীবনের ভিত্তিভূমি ছিল অতুলশিব ক্লাব। এখানে তিনি অজস্র নাটকে অভিনয় করেছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতবর্ষ উৎযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' নামক গ্রন্থে প্রবীণ নাট্যজন মহাদেব দত্তের লেখায় তারাশঙ্কর কর্তৃক অভিনীত নাটকের একটি তালিকা পাওয়া যায়- "কার্নাজুন নাটকে শকুনি, শেষ রক্ষায় চন্দ্র বিনোদ, চিরকুমার সভায় শ্রীশ, বঙ্গনারী তে যোগেশ্বর, বৈকুণ্ঠের খাতায় কেদার, বশীকরণ নাটকে ভৃত্য প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। শুধু তাই নয় সেসময় যেহেতু পুরুষেরাই মেয়ে সাজতো, তাই বেশ কয়েকটি নারী চরিত্রেও তারাশঙ্কর অভিনয় করেছেন। যেমন বঙ্গলক্ষী নাটকে বিনোদিনী, প্রফুল্ল নাটকে জ্ঞানোদা, সীতায় সীতা, চাঁদ বিবি নাটকে মরিয়ম, প্রতাপাদিত্য নাটকের কল্যানী, গৃহলক্ষীতে মেজ বউ প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য চরিত্র।"[৩৭]

তারাশঙ্কর নিজে 'মারাঠা তর্পণ' 'কালিন্দী', 'কবি' ইত্যাদি মিলিয়ে মোট **১১**টি নাটক লিখেছিলেন।[৩৮] লাভপুরে 'বন্দেমাতরম' নামেও একটি নাট্যমঞ্চ গড়ে উঠেছিল **১৯০৫** সালে।[৩৯] যদিও লাভপুর গ্রামে স্বাধীনতা আন্দোলন, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল কিন্তু নাট্যচর্চায় তার কোন প্রভাব পরেনি। তবে একটা কথা বলতেই হয় যে, নাটকের আনন্দ উপভোগ করতে এসে ধনি-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান, যুবক-বৃদ্ধ একই মঞ্চে সমবেত হয়েছিল, যার প্রভাব অনেকটাই সমকালীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পড়েছিল। তাছাড়া এখানে সাহিত্যিক বলতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এলেও কালিশরন চক্রবর্তী (কবিতা লেখতেন), লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কবি), নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ('অন্তরায়', 'অন্তঃসলিলা', 'ঘড়িওয়ালা', 'প্রভাতস্বপ্ন' প্রভৃতি গল্প ও 'প্রেমিক' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন) প্রমুখ লেখকের জন্মভিটা ছিল।[৪০] এই অঞ্চলের তিনজন সাহিত্যসেবী ছিলেন; যথা- চৌহাট্টার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, লাঘোষার রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও মোনাচিতুরার কমলাকান্ত পাঠক।[৪১] এছাড়া লাভপুর গ্রামের নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র) 'কাঁটা', 'অগ্রগতি', 'মাটির পুতুল' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[৪২]

১৮৫০এর দশকে বীরভূমে রেললাইন চালু হওয়ার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিলো। অনেক ছোট ছোট গ্রাম সময়ের সাথে সাথে বড় গ্রামে রুপান্তরিত হতে থাকে এবং হাট ও বাজার স্থাপিত হতে থাকে।[৪৩] গ্রামগুলি প্রান্ত গ্রামের রূপ ত্যাগ করে আধুনিক গ্রামের চেহারা গ্রহন করতে থাকে। **১৯১৭** সালে আহমেদপুর থেকে

কাটোয়া রেল ব্যবস্থা চালু হয়। ফলত, লাভপুর গ্রাম রেলের সুযোগ গ্রহন করতে থাকে। আশাপাশের গ্রামগঞ্জে যাতায়াত করার জন্যে স্টেশনের কাছেই লেগে থাকতো একখানা ট্যাক্সি, একখানা মোটর বাস, সাইকেল রিকশা, গোরুর গাড়ি প্রভৃতি।[৪৪] এই অঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবস্থার অনেক উন্নতি ঘটে। এই অঞ্চলে অনেক কবিরাজ থাকলেও পশ্চিমি চিকিৎসার সুযোগ যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে আসতে থাকে। দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতালে আগমন শুরু হয় সরকারি চিকিৎসকদের। সেই সময় ঐ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বি কে মেডিক্যাল স্টোর্স[৪৫], নবগ্রাম মেডিক্যাল হল[৪৬], উইলিয়াম চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি[৪৭], সঞ্জীবন ফার্মেসী[৪৮] ইত্যাদি।

লাভপুর গ্রামটি বর্তমানে বোলপুর উপবিভাগের অন্তর্গত। শান্তিনিকেতন গোটা বিশ্বে রবি ঠাকুরের প্রতিষ্ঠান বিশ্ব ভারতীর জন্য বিশেষভাবে সুপরিচিত। এছাড়া বীরভূমে সতীপীঠের (মোট ৫১) মধ্যে পাঁচটি বীরভূমে অবস্থিত। লাভপুরের নিকটেই অবস্থিত মা কঙ্কালিতলা (অন্যতম সতীপীঠ)। ফলে বহু মানুষ ধর্মীয়স্থান ও শান্তিনিকেতন পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে বীরভূমে ভিড় করে। বহু মানুষ ফুল্লরা দেবীর মন্দিরে পূজো দেওয়ার উদ্দেশ্যে ও অনেকটাই বোলপুর-শান্তিনিকেতনের কোলাহল থেকে দূরে এবং অনেক কম খরচে লাভপুরের অনেক অতিথিশালা, হোটেল ও লজে সময় কাটিয়ে যাচ্ছে। লাভপুর থেকে অনেকটাই কাছে সাইথিয়ার নন্দিকেশ্বরী মন্দির (সতীপীঠ) এবং তারপরেই তীর্থযাত্রীদের তথা সাধকদের গমনাস্থল হয়- মা তাঁরার পীঠ, তারাপীঠ। এছাড়া তারাশঙ্করের সংগ্রহশালা ধাত্রীদেবতা অতিথিদের অন্যতম আকর্ষণের জায়গা হয়ে উঠেছে। বর্তমানে লাভপুর গ্রাম অনেকটাই পুরানো গ্রামের ছোঁয়া ও অনেকটাই আধুনিকতার ছাপ নিয়ে এক সংমিশ্রিত রূপ পরিগ্রহন করে চলেছে।

Reference :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, দশম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪০১

২. সাদি, মাহফুজ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রেম, প্রকৃতি ও সমাজ চেতনা, sylhettoday24, ১৪/০৯/২০১৫ অথবা https://www.sylhettoday24.news/news/details/Literature/8923, দেখার শেষ তারিখ- ২২/০৩/২০২২

৩. O'Malley, L. S. S., Bengal District Gazetteers; Birbhum, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1910, p. 120

৪. তদেব

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, দশম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭

৬. Mitra, A, Census 1951, West Bengal District Handbook; Birbhum, p. 181

৭. তদেব, পৃ. lXXIV

৮. তদেব, পৃ. XVIII

৯. মুখোপাধ্যায়, শ্রীমহিমারঞ্জন, জাদব-জীবন, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলিকাতা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭-৮

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, দশম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২

১১. তদেব, পৃ. ৫১০

১২. তদেব, পৃ. ৫১৪

১৩. তদেব, পৃ. ৪৩৫-৩৬

১৪. তদেব, পৃ. ৪৬৬

১৫. তদেব, পৃ. ৪৭০

১৬. মুখোপাধ্যায়, শ্রীমহিমারঞ্জন, জাদব-জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ.১০
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, দশম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০
১৮. তদেব
১৯. তদেব, পৃ. ৪৩৫
২০. চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন, বীরভূম-বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ড, হেতমপুর-রাজবাটী-বীরভূম, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৩২
২১. তদেব, পৃ. ২৩০
২২. O'Malley, L. S. S., Bengal District Gazetteers; Birbhum, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
২৩. Mitra, A, Census 1951, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
২৪. তদেব
২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, দশম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩
২৬. তদেব, পৃ. ৪৪১
২৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩০৫
২৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, দশম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩
২৯. তদেব, পৃ. ৪৭৪
৩০. তদেব, পৃ. ৪৪১
৩১. তদেব, পৃ. ৪৬৭
৩২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আমার কালের কথা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১৩-১৪
৩৩. তদেব, পৃ. ১১৫
৩৪. Government of Bengal, Political Department, Police, Hydar Sheikh's gang of Birbhum and Burdwan, File No. P. 3-T-4(1), CT Act (III of 1911), April 1923, p. 96-97
৩৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২
৩৬. বসু, তরুন তপন ও সিংহ, সুকুমার (সম্পাদক), বীরভূমের মুখ, রাধারানী, ২১ শে আগস্ট ২০১৬, সিউড়ী, পৃ. ৪৪২
৩৭. সত্যনারায়ণ বান্দোপাধ্যায়– স্বহস্ত লিখিত আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি
৩৮. বসু, তরুন তপন ও সিংহ, সুকুমার (সম্পাদক), বীরভূমের মুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩২
৩৯. তদেব
৪০. পাল, সুনীল, লাভপুর ও কীর্ণাহার: বিষয়ের বৃত্তে, আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১২-১৩
৪১. তদেব, পৃ. ২৬
৪২. তদেব, পৃ. ৩৬
৪৩. Gupta, Ranjan Kumar, The Economic Life of Bengal District Birbhum: 1770-1857, The University of Burdwan, 1984, p. 259
৪৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আরোগ্য নিকেতন, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩
৪৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮২ (এই দোকানের মালিক ছিলেন বিনয়। প্রদ্যোত ডাক্তার এখানে বসতেন। বিনয় নিজে এলোপ্যাথিতে খুব একটা বিশ্বাসী ছিলেন না, কারণ এই ধরনের চিকিৎসায় রক্ত পরীক্ষা, মল মূত্র ও থুতু পরীক্ষা, এক্সরে প্রভৃতি করা হত। ফলত, তিনি বলতেন এরুপভাবে যে কেউ চিকিৎসা করতে পারে।)

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 244-250
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪৬. তদেব, পৃ. ১৮৯

৪৭. তদেব, পৃ. ২১৪ (এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নবগ্রামের বাসিন্দা ব্রজলাল বাবু)

৪৮. তদেব, পৃ. ২৩২